মিত্রোখিন রহস্য - ৫

মিজানুর রহমান খান

মুজিব জানতেন না পিছু নিয়েছে কেজিবি

সোভিয়েত গোয়েন্দা কর্মকর্তা ভাসিলি মিত্রোখিন তথ্য দিয়েছেন, ষাটের দশকের শেষাশেষি পাকিস্তানের বিভক্তি রুশ-ভারতের স্বার্থের পরিপূরক হবে এই মর্মে সিদ্ধান্তে পৌঁছায়। এবং কেজিবি সে কারণেই স্বায়ত্তশাসনবাদী আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে 'কালটিভেট' বা প্ররোচিত করার সিদ্ধান্ত নেয় *(মিত্রোখিন আর্কাইভ, পৃষ্ঠা-৪৪৭)*।

কেজিবি নেহরুর বামঘেঁষা ঘনিষ্ঠ উপদেষ্টা কৃষ্ণ মেনন ও পরে ইন্দিরা গান্ধীকেও কিন্তু একইভাবে পটানোর উদ্যোগ নেয়।

১৯৫৫ সালে ন্যাম জোটের বান্দুং সম্মেলনের মাধ্যমে নাসের ও টিটোর সঙ্গে নেহরু পাদপ্রদীপে এলে মস্কো নেহরুর প্রতি বিশেষ মনোযোগী হয়ে ওঠে। ওই বছরেই নেহরু ও ক্রুশ্চেভের পরস্পরের দেশ সফর ছিল রুশ-ভারত সম্পর্কের নতুন দিগন্তের সূচনা। *(মিত্রোখিন, পৃষ্ঠা-৩১৫)* মিত্রোখিন লিখেছেন, কেজিবি ধরে নিয়েছিল মেনন হবেন নেহরুর সম্ভাব্য উত্তরাধিকার। ১৯৬২-র মে মাসে সোভিয়েত প্রেসিডিয়াম দিল্লির কেজিবি মিশনকে ভারতের রাজনীতিতে মেননকে শক্তিশালী করতে সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ প্রস্তাবে অনুমোদন দেয়। প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসেবে মেননের আমলেই ভারতের সমরাস্ত্র-নির্ভরতা পাশ্চাত্য থেকে মস্কো কেন্দ্রিকতায় রূপ নেয়। (মিত্রোখিন, পৃষ্ঠা-৩১৫)। তবে '৬২-এর ইন্দোচীন যুদ্ধের পরে মেননকে মন্ত্রিত্ব ছাড়তে হয়। কিন্তু সাত বছর পরে কমিউনিস্টদের সমর্থনে পশ্চিমবঙ্গের তামলুক থেকে তিনি স্বতন্ত্র সদস্য নির্বাচিত হন। '৬৬-র জানুয়ারিতে লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর মৃত্যুর পরে কংগ্রেস ইন্দিরা গান্ধীকে *(কেজিবির সাংকেতিক নাম বানু)* নেতৃত্বে বসায়। ১৯৫৩ সালে স্টালিনের মৃত্যুর কয়েক মাসের মধ্যে ইন্দিরা মস্কো সফরে গিয়ে সোভিয়েত ব্যবস্থা দেখে মুগ্ধ হন। মিত্রোখিন ৩১৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, পঞ্চাশের দশকের গোড়ায় কেজিবি ইন্দিরাকে পটাতে শুরু করে। তবে এটা ইন্দিরার নিজস্ব ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক ক্যারিয়ার বিবেচনায় নয়, নেহেরুর ওপর প্রভাব বিস্তার করতে।

মিত্রোখিন ৩৪৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, 'শেখ মুজিব তাকে ঘিরে যে কেজিবির সক্রিয় উদ্যোগ সে সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। তবে মুজিবকে তারা এটা বোঝাতে সক্ষম হন যে, ১৯৬৮ সালের জানুয়ারিতে তাকে গ্রেপ্তারের পেছনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাত ছিল।' (১৯৬৬ সালের ৮ মে থেকে আটক শেখ মুজিবকে '৬৬-র ১৭ জানুয়ারি ঢাকা জেল থেকে মুক্তি দিয়ে জেল ফটক থেকে গ্রেপ্তার করে ঢাকা সেনানিবাসে আটক রাখে) ওই সময় তার বিরুদ্ধে তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযোগ আনা হয়। ১৯৬৮ সালের ১৯ জুন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শুনানি শুরু হয়। ওই মামলার মূল কথা ছিল, ভারতীয় সাহায্যে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করতে মুজিব ভারতীয় কর্মকর্তাদের সঙ্গে সীমান্ত শহর আগরতলায় বৈঠক করেছিলেন। এখানে উল্লেখ্য যে, আমেরিকানদের কাছে মুজিব মিত্র হিসেবেই গণ্য হতেন। তাই আমেরিকা সম্পর্কে তাকে মিত্রোখিন ৩৪৭ পৃষ্ঠায় দাবি করেন, কেজিবি একজন তৃতীয় ব্যক্তির মাধ্যমে ১৯৬৯ সালের সেপ্টেম্বরে মুজিবকে অবহিত করে যে, 'ষড়যন্ত্রকারী' হিসেবে চিহ্নিতদের নামগুলো আইউবের কাছে যিনি ব্যক্তিগতভাবে হস্তান্তর করেন তিনি মার্কিন রাষ্ট্রদূত স্বয়ং। তবে কে ওই তৃতীয় ব্যক্তি তার পরিচয় উল্লেখ করা হয়নি।

বেঞ্জামিন এইচ ওয়েলার্ট জুনিয়র ১৯৬৭ সালের ২৭ জুলাই থেকে ১৭ জুন ১৯৬৯ পর্যন্ত এবং ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৬৯ থেকে ৩০ এ প্রিল ১৯৭২ যোশেফ ফারল্যান্ড ছিলেন পাকিস্তানে মার্কিন রাষ্ট্রদূত।

মিত্রোখিন লিখেছেন, কেজিবির এক রিপোর্ট অনুসারে ভুয়া তথ্য দিয়ে মুজিবকে তারা বিভ্রান্ত করতে পুরোপুরি সক্ষম হয়। এই রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, মুজিবের ঘনিষ্ঠদের মধ্যে কেউ না কেউ এ ব্যাপারে আমেরিকানদের কাছে তথ্য পাচার করেছিল। ৫৬৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত ফুটনোট দেখে মনে হয়, কেজিবির ওই রিপোর্টের বিস্তারিত মিত্রোখিন আর্কাইভের অপ্রকাশিত অংশে রয়েছে।

মিত্রোখিনের উল্লিখিত দাবি সম্পর্কে মন্তব্য চাওয়া হলে বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সহকর্মী ও আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য তোফায়েল আহমেদ বলেন, 'মনে হচ্ছে এর পুরোটাই আষাঢ়ে গল্প।'

মিত্রোখিন লিখেছেন, ১৯৬৯ সালের শেষের দিকে ইয়াহিয়া খান সামরিক আইন সত্ত্বেও ঘোষণা দেন যে, ১৯৭০ সালের এক জানুয়ারিতে দলীয় রাজনীতি চালু করা যাবে। এর লক্ষ্য ছিল বছর শেষে অনুষ্ঠেয় নির্বাচনের প্রস্তুতি। কেজিবি সদর দপ্তরের মূল কৌশল ছিল ভুট্টোর পিপিপি যাতে পশ্চিম পাকিস্তানে এবং মুজিবের আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানে জয়লাভ করে *(মিত্রোখিন, পৃষ্ঠা-৩৪৭)*। লক্ষণীয়, ভারতীয় কলামিস্ট কুলদীপ নায়ার লিখেছেন, ১৬ ডিসেম্বর ২০০৫ ইসলামাবাদে একজন অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার আমার কাছে তথ্য প্রকাশ করেন যে, সত্তরের নির্বাচন অনুষ্ঠান এমনভাবে 'সংঘটিত' করতে তাদের ওপর নির্দেশ ছিল যাতে পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যসব দল পিপিপির কাছে পরাজিত হয় (প্রথম আলো, ২৫ ডিসেম্বর ২০০৫)।

১৯৭০ সালের জুন মাসে কেজিবির বৈদেশিক গোয়েন্দা শাখা এফসিডির দক্ষিণ এশীয় বিভাগের প্রধান ভি আই স্টার্টসেভ সার্ভিসে-এ প্রধান এন এ কসোভের সঙ্গে যৌথভাবে একটি বিস্তারিত সক্রিয় প্রচারণা কৌশল প্রণয়ন করেন। যার মূল মন্ত্র ছিল পিপিপি ও আওয়ামী লীগের সব বিরোধী নেতাকে কলঙ্কিত করা। *(মিত্রোখিন, পৃষ্ঠা-৩৪৭-৩৪৮)*

দেখা যাচ্ছে যেসব রাজনৈতিক দল ও নেতা এমনিতেই দক্ষিণপন্থি বা প্রতিক্রিয়াশীল হিসেবে গণ্য হতেন কেজিবি নিজেদের জন্য সাফল্যগাথা তৈরিতে তাদেরই এ ক্ষেত্রে টার্গেট হিসেবে বেছে নেয়। মিত্রোখিনের বয়ান অনুযায়ী, 'কাইউম মুসলিম লীগের সভাপতি আবদুল কাইউম খান ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৩ পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। তাকে নাজেহাল করতে এই তথ্য ছড়িয়ে দেওয়া হয় যে, ১৯৪৭ সালের আগে কাইউম খান পাকিস্তান সৃষ্টির বিরোধিতা করেন। কাউন্সিল মুসলিম লীগের প্রধান মিয়া মমতাজ দৌলতানাকে দেখানো হয় প্রথম কাতারের শীর্ষস্থানীয় ব্রিটিশ এজেন্ট হিসেবে। মিজ দৌলতানা অতীতে লন্ডনে বসবাস করতেন বলেই তার কপালে জোটে এই তকমা। দৌলতানার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক হত্যার সঙ্গে যোগসাজশেরও অভিযোগ প্রচারিত হয়। কনভেনশন মুসলিম লীগ নেতা ফজল এলাহি চৌধুরীকেও অতীতের রাজনৈতিক হত্যার সঙ্গে জড়ানোর পাশাপাশি ভুট্টো হত্যার পরিকল্পনার অন্যতম হিসেবেও চিহ্নিত করা হয়। পরিহাস হচ্ছে, ভুট্টোর পৃষ্ঠপোষকতায় এই ফজল এলাহি চৌধুরী ১৯৭৩ সালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হন। পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রেসিডেন্ট নুরুল আমিনকে পশ্চিম পাকিস্তানে অপদস্থ করা হয় এই বলে যে, তিনি 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' মামলার অন্যতম মুখ্য ব্যক্তি *(মিত্রোখিন, পৃষ্ঠা-৩৪৮)*।

ষাট ও সত্তর দশকে ক্রেমলিন পাকিস্তানের সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্ক উন্নয়নে নানাভাবে উদ্যোগী হয়।

১৯৬৫ সালের যুদ্ধে 'নিরপেক্ষ' ভূমিকা পালনের পর 'দুই রক্ত সম্পর্কের ভ্রাতার' মধ্যে আপস চেষ্টায় তার উদ্দেশ্য ছিল এই অঞ্চলে বহিঃশক্তির প্রভাব হ্রাস। মস্কো একটি নতুন রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ে বা সে জন্য কোনোরূপ ঝুঁকি নিতে একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। তার ধারণা ছিল, পাকিস্তান দুই টুকরো হলে প্রতিদ্বন্দ্বী চীনই উপকৃত হবে। *(মস্কো অ্যান্ড দ্য বার্থ অব বাংলাদেশ, বিজয় সেন বুধরাজ, এশিয়ান সার্ভে, মে, ১৯৭২ পৃঃ ৪৮৫)*

১৯৬৯-৭০ সালের অবমুক্তকৃত মার্কিন গোপন দলিল থেকেও দেখা যাচ্ছে, মার্কিন প্রশাসনের মূল্যায়নের সঙ্গে সোভিয়েত দৃষ্টিভঙ্গির সাযুজ্য রয়েছে। সিআইএ ১৯৬৯ সালেই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে, পাকিস্তান খণ্ডিত হলে চীন লাভবান হবে। ভারতেরও হিসাব ছিল একই।

সত্তরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের আর্থসামাজিক কর্মসূচি ছিল মস্কোর চোখে 'প্রগতিশীল'। আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ সিয়াটো ও সেন্টোতে পাকিস্তানের সদস্যপদ লাভের বিরোধী ছিল। উপরন্তু ভারতের সঙ্গে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ঘনিষ্ঠতা বজায় রাখতেও তারা ছিলেন উদগ্রীব। সুতরাং সোভিয়েতের হিসাব ছিল আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান এই অঞ্চলে তাদের অনুসৃত নীতি অধিকতর উত্তমরূপে সংহত করবে *(বুধরাজ, পৃঃ ৪৮৫)*।

১৯৬৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ইসলামাবাদকে তার প্রস্তাবিত অর্থনৈতিক আঞ্চলিক সহযোগিতা জোটে যোগদানের আমন্ত্রণ জানালে ইয়াহিয়া তা প্রত্যাখ্যান করেন। অথচ কয়েক সপ্তাহ আগেই তিনি এতে যোগ দিতে সম্মতি প্রকাশ করেন। ভারত, পাকিস্তান, ইরান ও আফগানিস্তান নিয়ে এই জোট গড়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করে মস্কো। এ পর্যায়ে সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ পাকিস্তানে এ কটি গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নির্ধারণ করেন। তার বিশ্বাস ছিল, এ ধরনের একটি সরকার ভিন্নপন্থা অনুসরণ করবে। কিন্তু ইয়াহিয়া পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক হামলা চালালে সোভিয়েতের এই আশায় বালি পড়ে *(বুধরাজ, পৃষ্ঠা-৪৮৩)*।

মিজানুর রহমান খান : সাংবাদিক।

ষষ্ঠ কিস্তি : বাঙালি বিপ্লবীদের কাছে চীনের 'চিঠি'